কালের কণ্ঠ

তারিখ 08 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৩৪ কলাম ৩

ড. নিয়াজ আহম্মেদ ▷

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীদের হয়রানি

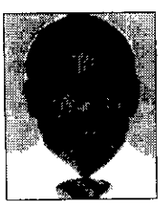

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বড় সমস্যা হলো ভয়। এ কারণে, অনেকে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকেন। অধরা থেকে যায় যৌন হয়রানির বহু ঘটনা। সবচেয়ে ভয়ানক বিষয় হলো, অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরও কোনো না কোনো কারণে শাস্তি থেকে রেহাইয়ের প্রবণতা। এতে করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। আবার আমাদের দেশের আইনিব্যবস্থায় প্রচলিত কোর্টের আদেশকে আমি সম্মান দেখাতে বাধ্য

মহামান্য হাইকোর্টের ২০০৯ সালের নির্দেশনা মোতাবেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করে। মূলত হাইকোর্ট একটি আচরণবিধি অনুমোদন দিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আলোকে আচরণবিধি প্রণয়নের জন্য বলেন। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, এমন আচরণবিধি প্রণয়নের জন্য কর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানকেও নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এর মৌলিক বিষয় ঠিক রেখে নামমাত্র পরিবর্তন ও কিছুটা সংযোজন করে প্রস্তাবিত আচরণবিধি সর্বোচ্চ বডি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করে। এ ধরনের আচরণবিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপট হয়তো অনেকেরই জানা। তখনকার সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির বিষয়টি এক চরম আকার ধারণ করে এবং কোনো নির্দিষ্ট আচরণবিধি না থাকার কারণে সরাসরি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করতে দেখা যায়। আমার যত দূর মনে পড়ে, সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু মহিলা শিক্ষক উপাচার্যের কাছে এ-সংক্রান্ত এক গুরুতর অভিযোগ দেন। এ ঘটনার পর কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বহু কীর্তিকলাপ পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট বিধি না থাকার কারণে এ-সংক্রান্ত সমস্যা পরিপূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মোকাবিলা করা সহজ হয় না। এ রকম অবস্থায় হাইকোর্ট নির্দেশনা দিলে বিষয়টি একটি কাঠামোর মধ্যে আসে। বিধির প্রারম্ভিক বক্তব্যে দেখা যায়, এটি শুধু সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীই নয়, ভভীচ্ছু এবং অভ্যাগত যেকোনো ব্যক্তি এর আওতায় আসবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মক্তবের শিক্ষকরাও এর আওতাভুক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিচার যখন প্রচলিত বিচারিক ব্যবস্থার মতো নয়, তখন এই বিধির আওতায় যে নিরোধকেন্দ্র গঠনের কথা বলা হয়েছে, তাতে আইনজীবীসহ ক্যাম্পাসের বাইরের বিভিন্ন পেশাদার ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত বিচারিক ব্যবস্থার সঙ্গে মানানসই। বিশ্ববিদ্যালয় যখন কোনো বিষয়ে তদন্ত কমিটি করে তখন তার নিজস্ব লোক দিয়েই করা হয়। ফলে ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দের বিষয়টি চলে আসে। কিন্তু নিরোধকেন্দ্রের বিষয়টি ভিন্ন। এখানে দুই পক্ষকে সরাসরি হাজিরের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য তুলে ধরা এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রাখা হয়েছে। যদি কেউ হয়রানির জন্য মিথ্যা অভিযোগ করে, তার বিরুদ্ধেও শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা শাস্তির ব্যবস্থা। শাস্তির বিধানের মধ্যে সবার জন্য সর্বোচ্চ যে বিষয়টি রয়েছে, তা হলো চাকরিচ্যুত ও রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর। এ বিধানটি এ কারণে গুরুত্ব বহন করে যে চাকরিচ্যুতি একজনের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে না। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় এর বেশি শাস্তি দিতে পারে না এবং প্রচলিত আইনে তার শাস্তি কাম্য, যার ফলে এই বিধান যথার্থ। পুরো বিচারকর্ম সম্পাদনের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা বিবেচনায় গোপনীয়তার কথা বলা হয়েছে। আরো আছে হয়রানির শিকার শিক্ষার্থীটির মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা। আচরণবিধিটিতে একাধারে বিচারিক প্রক্রিয়ায় শাস্তির ব্যবস্থা, অন্যদিকে সুরক্ষার বিষয়টি সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য হিসেবে হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক আচরণবিধি প্রণয়ন করার কিছু দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হয়েছিল। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণবিধি, যা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রায় একই ধরনের, তা বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে এটি সুনির্দিষ্ট, পূর্ণাঙ্গ, যুগোপযুগী আচরণবিধি নয়। বাংলাদেশের সব পাবলিক, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও চাকরি প্রতিষ্ঠানে এমন বিধিমালা রয়েছে কি না তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য আমার কাছে নেই, তবে আমার মনে হয় নেই। সম্প্রতি একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় 'আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে' একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন উত্তাল। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। আমি যতটুকু জানি, আচরণবিধিতে বলা আছে, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিষয়াবলি তদন্ত কমিটিতে নয়, নিরোধকেন্দ্রে অভিযোগ করতে হয়। হয়রানির শিকার ব্যক্তিটি যে পর্যায়েরই হোক না কেন, তিনি নিজে কিংবা কারো মাধ্যমে অভিযোগ করতে পারেন। যেখানে আচরণবিধি থাকার সম্ভাবনা নেই, সেখানে নিরোধকেন্দ্র আসবে কোথা থেকে। আর নিরোধকেন্দ্র গঠিত হয় বিভিন্ন ক্যাটাগরির ব্যক্তিদের নিয়ে, সেখানে অভিযুক্ত শিক্ষকের সাজা না হওয়ার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ভয় কম থাকে।

বিধিটি সুনির্দিষ্ট, স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ বলার পরও বড় প্রশ্ন রয়ে যায়, সব কিছু সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে সম্পাদন করা এবং নির্বিশেষে সঠিক শাস্তির বিধান কার্যকর করা। এখানেই আমাদের বড় সমস্যা। কিছু ফাঁকফোকরের ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তিটি শাস্তির আওতায় নাও আসতে পারে। বিবিধ কারণে এমনটি হতে পারে। তদন্ত কমিটি যা তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার পছন্দমতো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দিয়ে করে কিংবা নিরোধকেন্দ্রের মাধ্যমে হোক এ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, মন্তব্য ও মূল বিষয় সুপারিশমালা সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুপারিশ হতে হবে একেবারে স্পষ্ট। যেমন এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে ইত্যাদি। তা না হলে প্রচলিত আইন ও বিচারিক কাঠামোর মতো উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে এখানেও অপরাধ করার পর কেউ কেউ পার পেয়ে যেতে পারে। আবার সব কিছু ঠিক থাকার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান রাজনৈতিক বিবেচনা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও প্রভাব-প্রতিপত্তি শাস্তি না পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বড় সমস্যা হলো ভয়। এ কারণে অনেকে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকেন। অধরা থেকে যায় যৌন হয়রানির বহু ঘটনা। সবচেয়ে ভয়ানক বিষয় হলো, অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরও কোনো না কোনো কারণে শাস্তি থেকে রেহাইয়ের প্রবণতা। এতে করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। আবার আমাদের দেশের আইনিব্যবস্থায় প্রচলিত কোর্টের আদেশকে আমি সম্মান দেখাতে বাধ্য। ফলে কোর্টের আদেশের জন্য কারো কারো শাস্তি স্থগিত করতে হচ্ছে। এখানে কাউকে কাউকে মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করতেও দেখা যায়। এমন জটিল ও মিশ্র অবস্থার মধ্যে থেকে সঠিক ও সত্য ঘটনাকে মিথ্যা ও মিথ্যা ঘটনাকে সঠিক বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফলে আমাদের কাছে অনেক কিছু অজানা থেকে যায়। সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনায় সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় এক ধরনের বিস্ফোরণোন্মুখ পরিবেশ তৈরি হয়। অনেক সময় তা সামাল দেওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটি আমরা এ মুহূর্তে লক্ষ করছি আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাদের এ সময়ে প্রয়োজন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যাদের আচরণবিধি নেই তাদের হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক আচরণবিধি তৈরি করা এবং কঠোরভাবে তা বাস্তবায়ন করা। এর ফলে শাস্তিদানে জটিলতার অবসান হবে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রথম দিন এ পরিবারের সদস্যদের আচরণবিধি ধরিয়ে দেওয়া, যাতে প্রথম দিন থেকেই তারা এ বিষয়ে সতর্ক হতে পারে। তাহলে কিছুটা সচেতনতা আসতে পারে।

লেখক : অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
neazahmed 2002@yahoo.com